বিশ্বমানবতার প্রতি বিশ্বনবীর শাশ্বত অবদান

رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للإنسانية

< بنغالي >

সিরাজুল ইসলাম আলী আকবর

سراج الإسلام علي أكبر

সম্পাদক:

ইকবাল হোছাইন মাছুম

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مراجعة:

إقبال حسين معصوم

د/ أبو بكر محمد زكريا

বিশ্বমানবতার প্রতি বিশ্বনবীর শাশ্বত অবদান

দীন ও রিসালাতের ইতিহাসে অনন্য ঘোষণা,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾ [الانبياء: ١٠٧]

“আর আমরা আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭]

বস্তুত ধর্ম ও রিসালাতের ইতিহাসে এ এক অনন্য ও দৃষ্টান্তহীন ঘোষণা। এই ঘোষণায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্বলোক ও তার মধ্যে অবস্থিত সব কিছুর জন্য আল্লাহর একমাত্র ‘রহমত’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার শাশ্বত কালাম কুরআন মাজীদে এ চূড়ান্ত ঘোষণা বিধৃত। আর কুরআন বিশ্বমানবের অধ্যয়নের চিরন্তন গ্রন্থ। দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ এ কালাম দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তিলওয়াত করছে। এ কুরআনের সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তা‘আলা নিজেই গ্রহণ করেছেন।

যুগ, কাল ও শতাব্দির সীমাহীন প্রেক্ষিতে আল্লাহর এ ঘোষণা যেমন অসাধারণ, তেমনি সম্পূর্ণ ব্যাতিক্রমধর্মী ও দৃষ্টান্তহীন। কাল, বংশ ও ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ের পরিবেষ্টনী থেকে মুক্ত হয়েই আল্লাহর এ অনন্য ঘোষণার তাৎপর্য ও যথার্থতা অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা বিশ্বনবীর অবস্থান স্থান-কাল-বংশের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতার বহু ঊর্ধ্বে। আল্লাহর এ ঘোষণায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল আরব উপদ্বীপ, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কিংবা কোনো বিশেষ মহাদেশের অথবা বিশেষ জাতি-গোষ্ঠী-বর্ণ-গোত্রের অথবা বিশেষ কোনো যুগের জন্য রহমত বলা হয় নি। বলা হয়েছে, তিনি সর্বকালের সমগ্র বিশ্বলোকের জন্য রহমত।

সত্যি কথা, এ ঘোষণার ব্যাপকতা, বিশালতা, উচ্চতা, বিরাটত্ব ও মহত্ব এবং চিরন্তনতা অনস্বীকার্য। বিশ্বের ঐতিহাসিক ও দার্শনিকগণ এ ঘোষণার যথার্থতা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। গোটা মানবীয় মেধা-চিন্তা, প্রতিভা-মণীষা এ ঘোষণার ফলে বিস্মিত, স্তম্ভিত। কেননা দুনিয়ার ধর্মমতসমূহে, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দর্শনের ইতিহাসে, সংস্কারমূলক আন্দোলন ও বিপ্লবী তৎপরতার বিবরণে এরূপ বিশ্ব-ব্যাপক ও সার্বজনীন ঘোষণার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রেও এরূপ কোনো ঘোষণার উল্লেখ নেই। কারো সম্পর্কেই এরূপ ঘোষণা কোনো ধর্মগ্রন্থে, কোনো জীবন চরিতে কোনো ব্যক্তি বা জনসমষ্ঠির জন্য কোনো দিনই উচ্চারিত হয় নি।

ধর্মের পর্যায়ে ও ধারাবাহিকতায় ইয়াহুদী ধর্ম প্রাচীনতম। তাতে স্বয়ং আল্লাহকে বনী ইসরাঈলের ‘রব’ বলে পরিচিত করা হয়েছে। বাইবেলের ‘পুরাতন নিয়ম’ অংশে ‘রাব্বুল আলামীন’ সমগ্র বিশ্বলোকের রব বলে স্বয়ং আল্লাহকে পরিচিত করা হয় নি। তাই পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের মধ্যে কারো জন্যে এ ধরণের কোনো ঘোষণার সন্ধান করা নিতান্তই অর্থহীন।

খ্রিস্টধর্মের গ্রন্থ ‘নতুন নিয়মে’ নবী ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেকে কেবল বনী ইসরাঈলের বিভ্রান্ত লোক সমষ্টিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য প্রেরিত বলে পরিচিত করেছেন। নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার প্রতি তার কোনো বক্তব্যই উদ্ধৃত হয় নি। হিন্দু ধর্মের গ্রন্থাবলীতে বড় বড় ব্যক্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে বটে; কিন্তু তারা কেউই বনী ইসরাঈলের নবী-রাসূলদের চেয়ে ভিন্নতর কোনো বিশেষত্বের দাবীদার ছিলেন না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সাধারণ

মানুষের কোনো স্থান নেই। তারা সকল প্রকার মানবিক মর্যাদা ও অধিকার থেকে জন্মগতভাবেই বঞ্চিত বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, নীচ জাতের লোকদেরকে সৃষ্টিকর্তা কেবল উঁচুজাতের লোকদের দাসত্ব করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন।

প্রাচীন ভারতের লোকেরা হিমালয়ের বাইরের জগত এবং মানুষ সম্পর্কে কিছুই জানত না। বহির্জগতের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগই ছিল না। বাইরের মানুষ সম্পর্কে জানার কোনো আগ্রহও তাদের ছিল না। কাজেই এখানে প্রেরিত কোনো মহাপুরুষকে বিশ্বের রহমত বলার প্রশ্নই উঠে না।

বিশ্ব নবীর বিশ্ব রহমত হওয়ার তাৎপর্য:

কোনো বস্তুর সঠিক মূল্যায়ন দুটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে হতে পারে। একটি তার পরিমিতি আর দ্বিতীয়টি তার অন্তর্নিহিত স্থান, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুরআনের উপরোদ্ধৃত ঘোষণা এ উভয় দিক দিয়েই বিবেচ্য। কেননা তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব, উচ্চমানের শাশ্বত শিক্ষা ও আদর্শ মানব জীবনে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করেছিল। নবতর দিকদর্শন ও কর্মতৎপরতার সূচনা করে দিয়েছিল। মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময়তার কার্যকর ব্যাবস্থা করেছিল, মানব জীবনের সার্বিক সমস্যা ও জটিলতার চূড়ান্ত সমাধান দিয়েছিল; মানুষের সকল দুঃখ দুর্দশা, অভাব-অনটন, নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়েছিল। মানুষের ওপর প্রকৃতভাবেই রহমত ও বরকতের ধারা ব্যাপকভাবে বর্ষিত হয়েছিল। তা যেমন পরিমিতির দিক দিয়ে অত্যন্ত বিরাট ও ব্যাপক, তেমনি সার্বিক কল্যাণ, বিশেষত্ব ও মানগত অবস্থার দিক দিয়েও তা ছিল তুলনাহীন-অসাধারণ।

'রহমত' শব্দটি সাধারণত কল্যাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষের যে কোনো প্রকারের কল্যাণই তার অন্তর্ভূক্ত। তার মাত্রা ও মানের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। কোনো বিশেষ ধরন বা রূপ নেই। তবে মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণ হচ্ছে তাকে (মানুষকে) বাঁচতে দেওয়া, বাঁচার অধিকার ও উপকরণাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিশু যখন মরণোন্মুখ হয়, পিতা-মাতা সন্তানের অবস্থা দেখে আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস ভারি করে, তখন আসে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক। ব্যবস্থাপনা ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবহারে মূমুর্ষু শিশু আল্লাহর হুকুমে বেঁচে উঠে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন বিশ্বমানবতার জন্য অনুরূপ রহমত ছাড়া আর কিছুই নয়।

কেননা তিনি বিশ্ব মানবতাকে চূড়ান্ত ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন। রক্ষা করার সর্বাধিক কার্যকর পথ নির্দেশ ও জীবন-বিধান দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে একজন মানুষের মৃত্যু একটি ধ্বংস; কিন্তু তার চাইতেও বড় ধ্বংস হচ্ছে গোটা মানব সমষ্টির ধ্বংস। এ দু'টি ধ্বংসের মধ্যে যে পার্থক্য, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মহাসমুদ্র শুধু ব্যক্তিদেরকেই গ্রাস করে না; বরং অসংখ্য জাতি, জনবসতি, শহর-নগর গ্রামকেও গ্রাস করে নেয়। বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠকে হজম করে ফেলে। এরূপ এক সর্বগ্রাসী মহাসমুদ্রের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নির্ধারণ মানবসভ্যাতার জন্য এক তুলনাহীন অবদান, সন্দেহ নেই।

দুনিয়ার মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞানের বিস্তার করেছেন, বিশ্বমানবতা তাদের প্রতি অবশ্যই চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু মানুষের যেসব জ্ঞানের দুশমন চতুর্দিকে ওঁৎ পেতে বসে আছে। যে কোনো মুহূর্তে হিংস্র শ্বাপদের মতো তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে পারে। সেসব থেকে মানুষকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিশ্চয় তার প্রতি সবচাইতে বড় অনুগ্রহ।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, এ বিশ্বলোকের একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক সম্পর্কে অজ্ঞতা, তাঁর মহান ও পবিত্র গুণাবলী ব্যাপারে অনবহিত এবং মানুষের ওপর তার অধিকার ও এখতিয়ার সম্পর্কে মূর্খতা সর্বগ্রাসী মহাসমুদ্রের তুলনায়ও অধিক ভয়াবহ। আর এই অজ্ঞতা ও মূর্খতার অনিবার্য পরিণতিতে শির্ক, কুসংস্কার ও প্রতিমা পূজার অবাঞ্ছিত জঞ্জালের তলায় নিষ্পেষিত হতে থাকা বিশ্বমানবতার পক্ষে চরম অবমাননাকর। কেননা তা মনুষ্যত্বের অবমাননা যেমন, মানুষের উচ্চতর মদমর্যাদারও অপমান ঠিক তেমনই।

‘জড়’ ও জঠরের দাসত্ব, সীমালঙ্ঘন, মর্যাদাহীন এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনার নির্বিচার চরিতার্থতা মানুষকে নিতান্তই জন্তুতে পরিণত করে। আর মানবাকৃতির জন্তুগুলো সমগ্র সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে দাঁড়ায়। অথচ মানুষের মনুষ্যত্বই যদি রক্ষিত না হয়, তাহলে মানব জন্মই একটা মস্ত বড় কলঙ্ক। এ কলঙ্ক শুধু মানব জাতির জন্য হয় না, হয় গোটা সৃষ্টিলোকের জন্য।

এই মহাসত্যকে সামনে রেখেই মহান সৃষ্টিকর্তা বিশ্বলোক ও মানবতার জন্য রহমতের অবারিত দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন ভূপৃষ্ঠের ওপর, প্রথম অবস্থিতি ও পদচারণার দিনই। সাধারণভাবে নবী রাসূল পাঠানো এবং বিশেষভাবে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতি সেই অসীম রহমত ও কল্যাণ বিধানেরই ধারাবাহিকতা (সূচনায় রয়েছেন আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম) আর এ ধারাবাহিকতার সর্বশেষ ‘কুঁড়ি’ হচ্ছেন শেষ দিন পর্যন্তকার জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ পর্যায়ে নদী পথে চলমান নৌকার মাঝি ও আরোহীদের কথপোকথনের বিখ্যাত উপকথাটি অবশ্যই স্মরণীয়।

১। নৌকারোহীরা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী। মাঝি যখন পাল তুলে অনুকূল বাতাসে তীব্র গতিতে নৌকা চালিয়ে নিচ্ছিল, তখন আরোহীদের মন স্ফুর্তিতে নেচে উঠল। বৃদ্ধ মাঝিকে জিজ্ঞাসা করা হল: মাঝি ভাই, লেখাপড়া কিছু শিখেছ? বলল: তার আর সুযোগ পেলাম কোথায়? তাহলে অন্তত পদার্থ বিজ্ঞান তো নিশ্চয় পড়েছ? বলল: আমি তো তার নাম পর্যন্ত শুনি নি। আবার জিজ্ঞাসা করা হল: জ্যামিতি তো কিছু পড়েছই কিংবা ভূগোল বা ইতিহাস? সব জিজ্ঞাসার জবাবে মাঝি যখন বলল: বিদ্যার্জন তো দূরের কথা সে এ সবের নামও শুনে নি জীবনে। তখন সব কজন ছাত্র অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। একসঙ্গে সকলেই বলে উঠল: তাহলে তোমার জীবনটাই তো বৃথা। এমনি সময় প্রচণ্ড ঝড় উঠল, বাতাসে পাল ছিড়ে গেল। মাঝি জিজ্ঞাসা করল: বাবুরা সাঁতার জানেন তো? ছাত্ররা বলল: না। এবার মাঝি বলল: তাহলে আপনাদের সকলের গোটা জীবনটাই তো বৃথা।

বস্তুত বিশ্বমানবতার প্রতি নবী রাসূলগণের সবচাইতে বড় অবদান হচ্ছে- তাদেরকে অজ্ঞানতার কুল-কিনারহীন মহাসমুদ্রে ডুবে মরা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাঁতার কেটে বেঁচে থাকা ও সম্পূর্ণ নিরাপদে বেলা ভূমিতে পৌঁছে যাওয়ার উপযোগী জ্ঞান দান। সকল কালের মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নবী-রাসূলগণ প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে এ পার্থক্যটাই বিদ্যমান। জীবনের মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান অবস্থায় ভেসে থাকা ও সাঁতার কেটে কেটে কিনারায় পৌঁছে ধ্বংস থেকে বেঁচে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান মানুষ কেবলমাত্র তাদের মাধ্যমেই লাভ করেছে। আর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্তকার সর্বসাধারণ মানুষকে সেই মুক্তির শাশ্বত পথ দেখিয়ে গেছেন। এ কারণে তার নবুওয়াত ও রিসালাত চিরন্তন ও সার্বজনীন।

বিশ্বমানবতার ইতিহাস প্রমাণ করে, মানুষের নৈতিকতা ও চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দরুন এবং মনুষ্যত্ব বিধ্বংসি কার্যাবলীর কারণে মানব সমাজের জীবন তরী যখনই নিমজ্জমান হচ্ছে, ঠিক তখনই নবী-রাসূলগণ এসে সেই তরীর হাল ধরেছেন শক্ত হাতে এবং পর্বত সমান উঁচু তরঙ্গমালার উপর দিয়ে ভাসিয়ে তাকে কিনারার দিকে নিয়ে গেছেন অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে। এদিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবদান যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর ও অধিক সম্প্রসারিত। তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা, সকল কালের, সকল বংশের, সকল দেশের ও বর্ণের মানুষের জন্যই সর্বাধিক কল্যাণবহ।

যেই সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন, সেই যুগটি ইতিহাসে ‘জাহিলিয়াতের যুগ’ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই যুগটি কেবল সামষ্টিক বা নৈতিক পতনের যুগই ছিল না, শুধু পৌত্তলিকা বা জুয়া খেলায় মত্ত হয়ে থাকার যুগই ছিল না, নিছক যুলুম ও স্বৈরতন্ত্রের যুগই ছিল না, অর্থনৈতিক শোষণ লুণ্ঠনের যুগই ছিল না, নারীর অপমান নির্যাতন ও সদ্যজাত শিশু হত্যার যুগই ছিল না, এককথায় তা ছিল মনুষ্যত্ব ও মানবতার চরমতম অবমাননা ও দুর্দিনের যুগ, গোটা মানবতাকে চিরতরে সমাধিস্থ করার এক কঠিন কলঙ্কময় যুগ। মনুষ্যত্ব চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে যুগে এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ﴾ [ال عمران: ١٠٣]

“আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

এরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্বনবীর আগমন সমাজে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তা স্বয়ং তাঁরই একটি কথায় স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন,

“আমার আর তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালাল তখন চতুর্দিক আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠল আর পঙ্গপাল ও অন্যান্য পোকামাকড় তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করল। আর সেই ব্যক্তি সেগুলোকে তা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তা সত্বেও তারা এই বাধা লঙ্ঘন করে সেগুলো সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল। তোমরা ধরে নিতে পার, আমিই সেই ব্যক্তি, যে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া লোকগুলোকে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু তোমরা তা মানছ না। তোমরা সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়েই চলেছ। আর আমি তোমাদেরকে বলছি, আগুন থেকে সাবধান! আগুন থেকে সাবধান!” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

প্রকৃত অবস্থাও ছিল তাই। সেই সময় ও তার পরবর্তী কালের সমস্ত মানুষের জীবন তরীকে পূর্ণ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা সহকারে মুক্তি ও নিষ্কৃতির বেলাভূমে পৌঁছিয়ে দেওয়াই ছিল বিশ্বনবীর প্রধান কাজ।

সমস্ত মানুষকে মনুষ্যত্বের সুস্থ প্রকৃতিতে সুসংগঠিত ও উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করাই ছিল বিশ্বনবীর সাধনা। বস্তুত মানবতাই হচ্ছে নবী-রাসূলদের কর্মক্ষেত্র। তাঁরাই মানুষের উপর ঝুলে থাকা কঠিন বিপদের শানিত তরবারির নিচ থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন, যা কোনো পরিকল্পিত জ্ঞান বিজ্ঞান করতে পারে নি। পারে নি কোনো বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। মানবাতিহাসে যখনই এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেছে, ঠিক তখনই নবী রাসূলগণ আগমন করে তাদেরকে সে অধিকার দিয়ে ধন্য করেছেন। তখন মানুষ শুধু বেঁচেই থাকেনি, বেঁচে থেকেছে পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে। মানুষ যখন সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে

তাদের জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, তখনই নবী-রাসূলগণ তাদেরকে প্রকৃত লক্ষ্য চোখের সম্মুখে সমুদ্ভাসিত করে তুলেছেন এবং পূর্ণ মাত্রায় পরিচালিত করেছেন সেই লক্ষ্যের দিকে।

জাহিলিয়াতের যুগে মানুষের জীবন শুধু নিঃশেষিত হয় নি, তাদের দেহ পঁচে গলে অসহনীয় দুর্গন্ধে চতুর্দিক পঙ্কিল করে তুলেছিল। ঠিক এইরূপ কঠিন সময়ই সংগঠিত হয়েছিল বিশ্বনবীর মহান আগমন। আর তখনই আকাশ থেকে ঘোষিত হলো:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]

“আর আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭]

বিশ্বনবী সৃষ্ট নতুন জগত:

আমাদের এ যুগ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগসমূহকে মূলতঃ বিশ্বনবীর যুগ বলতে হবে। তার শাশ্বত দাওয়াতের যুগ এটা। কেননা মানবতা বিধ্বংসি ঝুলন্ত তরবারীটি তিনিই প্রথমে তুলে ফেলেছেন। তারপর মহা-মূল্যবান অবদানে তিনি বিশ্বমানবতাকে ধন্য করেছেন। মানবতাকে তিনি মুক্তির অবিনব পথ ও পন্থা দেখিয়েছেন, জীবন যাপন ও তৎপরতা পরিচালনের নতুন দিশার উদ্বোধন করেছেন। নতুন আশার নতুন স্বপ্ন এবং সম্পূর্ণ নতুন ভাবনা, চিন্তা ও আকিদা- বিশ্বাস দিয়ে মুমূর্ষু মানবতাকে তিনিই তো নতুন জীবনী শক্তি সঞ্জীবিত করেছেন। পৃথিবী ব্যাপী সূচিত হয়েছে এক নতুন সভ্যতার অন্তহীন সম্ভাবনা।

বিশ্বনবীর অবদানকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করে যে মহা-মূল্যবান আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় তাই হচ্ছে বিশ্বমানবতার প্রকৃত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

১। পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত তাওহিদি আকিদা:

বিশ্বমানবতার প্রতি বিশ্বনবীর অবদানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য হচ্ছে: পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত তাওহীদী আকীদা। বস্তুত এ আকীদা-বিশ্বাস সমগ্র মানব জীবনের ওপর বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তারকারী। তা ব্যক্তিকে যেমন এক স্বতন্ত্র জীবনী শক্তিতে সমৃদ্ধ করে, তেমনি গোটা সমাজ সমষ্টিকে, সমাজের সকল দিক ও বিভাগকে বিপ্লবী ভাবধারায় উজ্জিবীত করে তোলে। এই আকিদার ফলেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার বাতিল আকীদা-বিশ্বাস, দেব-দেবী পূজা ও তার কুৎসিত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করে। আর সমাজ সমষ্টি নিষ্কৃতি পায় সকল প্রকারের বাতিল মতাদর্শ ও নির্যাতনমূলক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা-বিশ্বাস ও ব্যাবস্থা থেকে, যা থেকে মানুষ অপর কোনো উপায়েই মুক্তি পেতে পারে না।

জাহেলিয়াতের যুগে এ তওহীদী আকীদা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অবলুপ্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অনাস্বাদিত। তৎকালীন বিশ্বের মানুষ ছিল পুরামাত্রায় শির্কী আকীদার অনুসারী। যখন তাওহীদী আকীদার হিতকারী ধ্বনি উচ্চারিত হল, শির্ক ও মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসের অন্ধ গহ্বরে নিমজ্জিত বিশ্বমানবতা হতচকিত হয়ে উঠল। থরথরে কেঁপে উঠল তাদের অসাড় আকিদার দুর্বল সৌধ। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলে এর ভিত্তিতে গড়া নড়বড়ে প্রাসাদ ও দূর্গসমূহ। মানবতা পেল সত্যিকারের মুক্তি। পেয়ে গেল সেরা সৃষ্টি হওয়ার মহান মর্যাদা ও অধিকার। মানুষ সকল প্রকারের হীনতা-নীচতা ও অনৈতিক পংকিলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

২। মানবতার সাম্য ও মৈত্রী

বিশ্বনবীর দ্বিতীয় অবদান হচ্ছে, বিশ্বমানবতার ঐক্য, অভিন্নতা এবং পূর্ণ মাত্রার সাম্য। মানুষ সাধারণত বিভিন্ন আকার আকৃতির হয়ে থাকে। তাদের গায়ের বর্ণও অভিন্ন নয়। এমনকি তাদের নিকট অতীতের বংশীয় ধারাবাহিকতাও অভিন্ন থাকে নি। কিন্তু মৌলিকতার দিক দিয়ে মানুষ যে একই বংশোদ্ভুত, একই পিতা ও মাতার সন্তান, তা প্রথমবারের মতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কণ্ঠেই ধ্বনিত ও প্রচারিত হলো। অথচ তখনকার দুনিয়ার মানুষ সংকীর্ণ গোত্র শ্রেণী, বর্ণ ও বংশে অত্যন্ত করুণভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এসবের মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষের মধ্যে অভিন্নতা ও ঐক্য পর্যায়ে কোনো ধারণা পর্যন্ত ছিল না, তখনকার দুনিয়ার কোনো একটি সমাজেও; বরং মানুষ ছিল মানুষের দাসানুদাস, মানুষ ছিল মানুষের প্রভু। মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঠিক সেই পার্থক্য বিদ্যমান ছিল, যা ছিল মানুষ ও পশুর মধ্যে। ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

"হে মানুষ! তোমাদের রব–প্রভু ও সার্বভৌম মাত্র একজন (অর্থাৎ আল্লাহ)। তোমাদের সকলের পিতাও একজন। তোমরা সকলেই আদমের বংশধর আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন। আর তাকওয়ার ভিত্তি ছাড়া কোনো আরবের বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই অনারবের ওপর।

এ ঘোষণাতে দু'টি বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে। সেই দু'টি বিষয়ের ওপরই বিশ্ব শান্তি নির্ভর করে। প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক সমাজে কেবল এ দু'টি বিষয়ের ভিত্তিতেই প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। আর তা হচ্ছে রব-এর এক ও অভিন্ন হওয়া এবং বিশ্বমানবতার একত্ব ও অভিন্নতা।

রব-এর এক ও অভিন্ন হওয়ার অর্থ, মানুষের উপাস্য, স্রষ্টা-রিযিকদাতা ও আইনবিধাতা তথা সার্বভৌম একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া এ সব গুণের অধিকারী আর কেউ নেই, আর কেউ নয়। উপাস্য একজন আর আইনদাতা অন্যজন এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য।

মানুষের রব, মা'বুদ বা উপাস্য ও সার্বভৌম একমাত্র আল্লাহ। এটাই হচ্ছে বিশ্বদর্শন ও সমাজ দর্শনের মৌলভিত্তি। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, সকল মানুষ একই বংশজাত। সকলের দেহেই একই পিতা-মাতার রক্ত প্রবাহমান।

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ [النساء: ١]

"হে মানব সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর। যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১]

বস্তুত এ দু'টি ঘোষণা যেমন ছিল সম্পূর্ণ অভিনব, তেমনি তদানীন্তন সমাজ পরিবেশে ছিল অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক। সে কালের সমাজ প্রাসাদের পক্ষে তা ছিল এক প্রলয় সৃষ্টিকারী কম্পন। তখনকার দুনিয়া এরূপ একটি বিপ্লবাত্মক ঘোষণার সাথে কিছুমাত্র পরিচিত ছিল না। এই ঘোষণার আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল শির্ক, মুর্তি পূজা, মানুষের গোলামী, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, পৌরহিত্যবাদ ও নৈরাজ্যবাদদের সর্বব্যাপী দুশ্চেদ্য জাল। যদিও আজকের দিনের বহু আন্তর্জাতিক সংস্থাই এ ধরনের কথা বলছে। মানবাধিকার সনদ রচিত ও ঘোষিত হয়েছে। মানুষের সাম্যের ধ্বনি তোলা হয়েছে। কিন্তু সে দিনের মানুষ এসবের কিছুই জানত না। তখনকার মানুষ বংশীয় ও গোত্রীয় হীনতার

তারতম্যে মর্মান্তিকভাবে বিভক্ত ছিল। কোনো কোনো বংশ নিজেদেরকে সূর্য বা চন্দ্রের অধীনস্ত বলে দাবী করত। ইয়াহূদী-খ্রিস্টানরা নিজেদের সম্পর্কে বলত, (আমরাই হচ্ছি আল্লাহর সন্তান ও সর্বাধিক প্রিয় লোক।)

আর কয়েক হাজার বছর পূর্বে মিশরের ফির'আউনের দাবী ছিল, আমরা সূর্যের অর্থ্যাৎ আল্লাহর প্রতিবিম্ব। তার প্রভাব চতুর্দিকে সমান বিদ্যমান। উপমহাদেশে তখন সূর্যবংশের (অর্থাৎ সূর্যের সন্তান ও চন্দ্রের বংশধর) রাজত্ব চলছিল।

পারস্যের কিসরারা মনে করত, তাদের দেহে আল্লাহর রক্ত প্রবাহমান। জনগণ তাদের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবোধ সহকারে তাকাত। রোমের কাইজারও মানুষের আল্লাহ হয়ে বসেছিল। লোকদের ধারণা ছিল, যারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়, তারাই আল্লাহ। তাদের উপাধী দেওয়া হয়েছিল মহিমান্বিত, সম্মানিত, অতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ।
এ দিকে চীনের লোকেরা সম্রাটকে 'আকাশ-পুত্র' মনে করত। তাদের বিশ্বাস ছিল আকাশ পুরুষ, পৃথিবী স্ত্রী। আর দুয়ের সম্মেলনে বিশ্বের অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

বস্তুত এ সব ধারণা যে নিতান্তই কুসংস্কার ও অজ্ঞতাপ্রসূত তা সেদিনের লোকেরা উপলব্ধি করতে ছিল সম্পূর্ণ অক্ষম। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের ফলেই এ ধরনের অসংখ্য ভিত্তিহীন ধারণার অসারতা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয়েছে বিশ্বমানবতার পক্ষে।

৩। মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব:

বিশ্বমানবতার প্রতি বিশ্বনবীর তৃতীয় অবদান হচ্ছে, সৃষ্টিলোকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতর মর্যাদার ঘোষণা। বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বে মানুষ ছিল লাঞ্চিত, অপমানিত। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কোনো মর্যাদাই স্বীকৃত ছিল না। ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের চেয়ে হীন ও নীচ জিনিস আর কিছু ছিল না। মানুষের তুলনায় কোনো কোনো বিশেষ জন্তু বা বিশেষ বৃক্ষের মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। সে বিশেষ জন্তু বা বৃক্ষের মর্যাদা ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মানুষকে অকাতরে বলিদান করা হত। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই দুনিয়ার সামনে সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন,
মানুষই এ সমগ্র সৃষ্টিলোকে একমাত্র সেরা সৃষ্টি- আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টিলোকের কোনো কিছুর তুলনায়ই মানুষ হীন নয়; বরং সকলের ঊর্ধ্বে আর তার উর্ধ্বে শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। তিনি ছাড়া মানুষের তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী আর কিছু নেই, আর কেউ নেই। এ পৃথিবীতে মানুষ একমাত্র আল্লাহর বান্দা এবং সেই সাথে সে আল্লাহর খলিফা। আল্লাহর বান্দা হয়ে তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করাই এখানে মানুষের কর্তৃব্য। আর তাতেই নিহিত মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অবস্থান। বিশ্বলোকের সবকিছুই মানুষের খেদমতে, তাদের কল্যাণে নিয়োজিত। মানুষের এই তুলনাহীন মর্যাদার ঘোষণা কেবলমাত্র বিশ্বনবীর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে। তার পূর্বে যেমন এরূপ ঘোষণা কেউ দেয় নি, বর্তমান সময় পর্যন্তও কেউ দেয় নি আর কেয়ামত পর্যন্ত কেউ দিতে পারবে না।

বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বে এক ব্যক্তির কামনা বাসনার পদমূলে শত সহস্র মানুষের জীবনকে উৎসর্গ করাও কিছুমাত্র অন্যায় বা নিন্দনীয় ছিল না। ফলে এক এক ব্যক্তি শক্তি বলে এক একটি দেশ দখল করে নিত আর দাসানুদাস বানিয়ে নিত লক্ষ কোটি মানুষকে। তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য ধ্বংস করা হত শহর-নগর-জনপদকে, নষ্ট করে দেওয়া হত শস্য শ্যামল ক্ষেত-খামার। হিংস্র ক্ষুধার্থ সিংহ যেমন সহসা জংগল থেকে বেরিয়ে এসে অসহায় মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে তাদের রক্ত পান করে নিজের জিঘাংসা চরিতার্থ করে।

মানব সমাজের সাধারণ অবস্থা এ থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। দূর অতীতে যেমন তার নিদর্শন মিলে, আজকের দুনিয়ায়ও তার দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়। এই সব কিছুর মূলেই রয়েছে ব্যক্তির লোভ-লালসা, সার্বভৌমত্বের খায়েশ এবং মানব সন্তানকে নিজের দাসানুদাস বানাবার প্রচণ্ড উন্মাদনা। কিন্তু বিশ্বনবী দরাজ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,

“মানুষ মানুষের দাস হতে পারে না। মানুষের প্রভু হতে পারে না তার মতই আরেক মানুষ; বরং মানুষ হিসেবে সকলেই সমান, সর্বতোভাবেই অভিন্ন। মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় লক্ষ্যহীন হতে পারে না। আর কোনো বৈষয়িক স্বার্থ বা সুযোগ-সুবিদা লাভ কিংবা জৈবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করাই মানুষের জীবন লক্ষ্য হতে পারে না।”

বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বে দুনিয়ার মানুষের কোনো জীবন লক্ষ্য নির্দিষ্ট কিংবা সুস্পষ্ট ছিল না। ছিল না উচ্চতর কোনো লক্ষ্যে কাজ করার ন্যূনতম প্রেরণা। তাই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, “মানুষ এই দুনিয়ার কেবলমাত্র বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই কাজ করবে। অন্য কারো অভিপ্রায় পুরণের জন্য মানুষ কিছু করতে বাধ্য নয়।”

৪। নৈরাশ্য ও হতাশার বিতাড়ন:

তদানীন্তন মানুষ ছিল হতাশাগ্রস্ত, নৈরাশ্যে জর্জরিত। আল্লাহর রহমত পাওয়ার কোনো আশাবাদ মানুষ পোষণ করত না। মানব প্রকৃতির প্রতি ছিল তীব্র ঘৃণা ও অত্যন্ত খারাপ ধারণা। কোনো কোনো প্রাচীন ধর্মমতও মানুষের মনে এই হতাশা ও ঘৃণা সৃষ্টির ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। উপমহাদেশের মানুষের মনে জন্মান্তরবাদ প্রবলভাবে বাসা বেঁধেছিল, যা মানুষের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে চক্রাকারে চলতে থাকে; ছিল বৈরাগ্যবাদ, যা মানুষকে বানিয়েছিল দুনিয়াত্যাগী-ঘর সংসার বিরাগী।

পক্ষান্তরে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করছিল, মানুষ জন্মগতভাবেই মহাপাপী। ঈসা-মসীহই শূলবিদ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে পাপী মানুষের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যাবস্থা করে গেছেন। ফলে খ্রিস্টধর্মালম্বী কোটি কোটি মানুষ নিজেদের সম্পর্কে অত্যন্ত হীন ধারণা পোষণ করতে থাকে। নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আশাবাদই খুঁজে পায় না তারা এবং নিজেদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে চির বঞ্চিত ধারণা করতে থাকে।

এ প্রেক্ষিতে বিশ্বনবী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, মানুষের প্রকৃতি নির্মল ও পরিচ্ছন্ন দর্পনের ন্যায়। মানুষ স্বাধীন; নিজের ভালো-মন্দ যাই করবে তারই প্রতিফল লাভ করবে অনিবার্যভাবে।

এ ঘোষণার ফলে মানুষের মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদের আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে। মানুষ বুঝতে পারে, ভুল মুর্খতার মধ্যে লিপ্ত হওয়ার কারণেই সে গুনাহ করে। অতীত গুনাহের ক্ষমা লাভের চিররুদ্ধ দুয়ার তার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যায়।

৫। দীন ও দুনিয়ার অভিন্নতা:

প্রাচীন কালের প্রায় সব কয়টি ধর্মমতই মানুষের জীবনকে দু'টি পরস্পর বিরোধী ধারায় বিভক্ত করে দিয়েছে। একটি তার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন আর অপরটি তার বৈষয়িক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন। একটির সাথে অপরটির কোনো দূরতম সম্পর্ক আছে বলে মেনে নেওয়া হয় নি।

এরই ফলে দুনিয়ার মানুষ যে ধর্ম পালন করত, তার কোনো প্রভাব তার বৈষয়িক জীবন পরিবার, রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর স্বীকার করত না। এসব ক্ষেত্রে তারা ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত নীতিতে কার্যাবলী পরিচালনা করত। সে ক্ষেত্রে তারা হত সম্পূর্ণরূপে ধর্মহীন। মানব সমাজেও এ বিভক্তি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব করে, যার দরুন এক

শ্রেণীর মানুষ হয় শুধু ধার্মিক আর অপর শ্রেণীর মানুষ হয়ে উঠে শুধু রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়ক। ধার্মিক লোকেরা শুধু ধর্ম কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের কোনো উৎসুক বা অংশীদারিত্ব ছিল না। ফলে ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। আর রাজনীতি ও রাষ্ট্র হয়েছিল ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বেচ্ছাচারিতার লীলাক্ষেত্র। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রের প্রধানরা পরস্পরকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিতে কুণ্ঠিত হত না।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বপ্রথম উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন: ধর্ম, জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো জিনিস নয়। আর একমাত্র ইসলামই যখন মানব জীবনের সকল প্রকারের প্রয়োজন পূর্ণ দক্ষতা সহকারে পুরণ করতে সক্ষম, তখন ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো ধর্মই মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বস্তুত বিশ্বনবী বিশ্বমানবের জন্য এক বিশ্বদীন উপস্থাপন করেছেন। বিশ্বলোককে যেমন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে করা যায় না, তেমনি বিশ্বমানবের জন্য এক সর্বাত্মক দীনই প্রয়োজন। সে দীনের চরমতম লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও তার সন্তুষ্টি অর্জন। কুরআন প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এ ঘোষণা করে দিয়েছে,

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

"বলো, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব। তার কোনো শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩]

৬। নেতৃত্বে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন:

বিশ্বনবী বিশ্বমানবের জন্য বিশ্ব আদর্শ হিসেবে দ্বীন ইসলাম পেশ করেই ক্ষান্ত হন নি, সেই সাথে সে আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য শর্ত হিসেবে পেশ করেছেন আদর্শবাদী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা। তাঁর দীনের তাওহীদী দাওয়াতের মূল আওয়াজই ছিল একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর এবং আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে উৎখাত কর।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবনে আনুগত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আনুগত্য ছাড়া কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত যেমন ছিল একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার, তেমনি সেই সাথে দাওয়াত ছিল একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করার। আর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে আল্লাহর আনুগত্যের অনুসঙ্গ হিসেবে। কেননা রাসূলের আনুগত্য না করে আল্লাহর আনুগত্য করা যায় না। এছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করা যেতে পারে তখন যদি সে আনুগত্য কার্যত: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে পরিণত হয়। যে আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে পরিণত হয় না, সে আনুগত্য কোনো ক্রমেই করা যেতে পারে না। কেননা তা তো কার্যত আল্লাহদ্রোহীতার শামিল।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশ পেয়েই শুরুতেই যে দাওয়াত জনসম্মুখে পেশ করেছিলেন তা ছিল, দাসত্ব কর নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহর এবং আল্লাহদ্রোহী ও আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘনকারী ব্যক্তিদের নেতৃত্ব উৎখাত কর। যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যতক্ষণ না আল্লাহদ্রোহীদের দাসত্বজনিত ফিতনা অবলুপ্ত হয় এবং সর্বাত্মক সার্বভৌমত্ব ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য নিশ্চিত হয়ে যায়।

দুনিয়ার মানুষের নিকট এ ছিল বিশ্বনবীর বিশ্ব বিপ্লবের আহ্বান। ফাসিক, ফাজির, কাফির, মুনাফিক, শোষক, যালিম ও স্বৈরাচার নেতৃত্বের অধীনে শতাব্দীকাল ধরে নির্যাতিত–নিষ্পেষিত মানবতার জন্য সার্বিক মুক্তির পয়গাম।

৭। নতুন মানুষ-নবতর জগত সৃষ্টির আহ্বান

বিশ্বনবীর এসব বিপ্লবাত্মক পয়গাম বিশ্বমানবতাকে নতুন বিপ্লবী ভাবধারায় গড়ে উঠে নবতর জগত সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছিল। এর ফলেই গড়ে উঠেছিল নতুন মানুষ, এক নতুন সমাজ। সে সমাজ সর্বপ্রকার কুসংস্কার, ভিত্তিহীন ধারণা-বিশ্বাস ও যুক্তিহীন দাসত্ব আনুগত্য থেকে মুক্তি পেয়েছিল। তাই সমাজের মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর আনুগত্য করতে এবং বিশ্বনবীর একক নেতৃত্ব ছাড়া আর কারোর নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য ছিল না। তিনি তদানীন্তন দুনিয়ার পারসিক ও রোমান -এ দুই পরাশক্তির মোকাবেলায় এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় এবং প্রতিষ্ঠিত দুই সভ্যতার ধ্বংসাবশের ওপর এক নতুন সভ্যতার উত্থান ঘটানোর সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি এক অভিনব শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তথায় প্রতিটি মানুষ পেয়েছিল তার শাশ্বত মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তা। আল্লাহর দেওয়া মৌলিক বিধান ও বিশ্বনবীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের ভিত্তিতে মানুষের যাবতীয় সমস্যার যথার্থ সমাধান সম্ভবপর হয়েছিল। তা থেকে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের সার্বিক মুক্তি একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও বিশ্বনবীর নেতৃত্ব গ্রহণেই সম্ভব। অন্য কোনোভাবে মানব জীবনের কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে না। শুধু তাই নয়, অন্য কারো আনুগত্য ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে মানব সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করা হলে সে সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়বে। মানুষ বঞ্চিত হবে তার আসল মর্যাদা ও অধিকার থেকে, হারিয়ে ফেলবে জীবনে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তাটুকুও। বর্তমান বিশ্বমানবের বাস্তব অবস্থাই তার অকাট্য প্রমাণ।

তা সত্বেও বিশ্বনবীর এ অবদান যেহেতু শাশ্বত, তাই আজকের দিনেও তা বাস্তবায়িত হলে সুফল পাওয়া সম্ভব। এ অবদানের বাস্তবায়নে আজও সম্ভব এক নবতর বিশ্বজয়ী সভ্যতার জন্মদান এবং আজকের ক্ষমতাদাবীদের দাপট খর্ব করে তাদের ধ্বংসাবষেশের ওপর এক নতুন মহাশক্তির প্রতিষ্ঠা। অবশ্য সে জন্য প্রয়োজন এক সর্বাত্মক জিহাদের। এ সত্য অনুধাবনে যত বিলম্ব হবে ততই প্রলম্বিত হবে বিশ্ব শান্তি। অনিশ্চিত হয়ে পড়বে পরকালীন মুক্তি। আল্লাহ আমাদেরকে সে সত্য বুঝার তাওফীক দিন। আমীন।

সমাপ্ত